ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1477-1488
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.369

মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটোগল্প: নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ও সংগ্রাম

সোমনাথ চ্যাটার্জী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 24.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

It is from the inquiry into life itself that the human crisis and struggle for survival begin. Since literature serves as the verbal expression of society, it naturally reflects the domestic and familial aspects of people's daily lives. In the works of the writer Mahasweta Devi (1926–2016), women forge a vital link—within their specific socio-economic and cultural contexts— between their own individual identities and the environments they inhabit. Their very modes of existence are invariably shaped by the various forms of social discrimination and prejudice prevalent in society. Through an analysis of five selected short stories— 'Giribala', 'Sanjh Sakaler Ma', 'Bayen', 'Dhauli', and 'Rudali'— this study explores and illustrates the diverse manifestations of women's crises and struggles for survival.

keywords: Existence, Social Power, Prestige, Crisis, Struggle, Self-realization

মানুষ তার জীবনযাত্রার সংগ্রামে অফুরন্ত পরিশ্রম করে চলেছে। তার এই পরিশ্রম "জীবিকার তাড়না ও জীবনের তাগিদ"[১]– এই দুইয়ের সমন্বিত অবস্থানের জন্য। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে ও নিজের মানব প্রকৃতিকেও পরিবর্তিত করে চলেছে। আর এই মানব সমাজে নারী তার গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবে তার অবস্থান সমাজে প্রকৃতপক্ষে কতটা হওয়া উচিত, তা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা গেছে। 'মনুসংহিতা'-য় বলা হয়েছে যে: "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে/ রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।"[২] (৯/৩) জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় নারীকে পরনির্ভর হতে দেখা যাচ্ছে। নারীকে কুমারী জীবনে বাবা, স্বামী যৌবনে ও পুত্রের দ্বারা বার্ধক্যে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। 'ন স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'- কথাটির মধ্যে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকের অন্তহীন পরিণামের ইঙ্গিত থেকে গেছে। ছোটোগল্পকার মহাশ্বেতা দেবীর (১৯২৬-২০১৬) ছোটোগল্পে নারী অসংখ্য অবরুদ্ধ অবস্থানের মাঝে দাঁড়িয়েও নিজের পথ খুঁজে নিতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। নির্বাচিত 'গিরিবালা', 'সাঁঝ সকালের মা', 'বাঁয়েন', 'ধৌলী' ও 'রুদালী'- এই পাঁচটি ছোটোগল্পে সমাজ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপের সঙ্গে নারীর মান-সম্মান, জ্বালা-যন্ত্রণা, দুঃখ-আর্তি অর্থাৎ বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে পরিলক্ষিত হয়েছে। নারী মা রূপে, স্ত্রী রূপে নিজের সন্তানটিকে যেমন বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে, তেমনই তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চেয়েছে। গল্পগুলিতে নারীর অস্তিত্বের সংকটও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সামাজিক সত্তা হিসেবে সেও যে একজন মানুষ, তারও যে ইচ্ছে-অনিচ্ছা, ভালোলাগা-মন্দলাগা থাকতে পারে, তা 'বাঁয়েন', 'ধৌলী', 'রুদালী'-র মতো গল্পগুলির ভেতর দিয়ে

উঠে এসেছে। "কেননা সংগ্রাম কখনো ফুরায় না।"[৩]- নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংকট ও সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন রূপ নির্বাচিত গল্পগুলিতে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে।

'গিরিবালা' গল্পে দেখা গেছে যে, নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রটি ভালোভাবে না দাঁড়ানো থাকলে তাকে প্রতিমুহূর্তে হতে হয় লাঞ্ছিত, প্রতারিত। "সবাই নিশ্চিত হল যে আউলচাঁদ নয়, গিরিবালা মেয়েটি আসলে মন্দ।"[৪] গিরিবালা মেয়েটিকে গ্রামের মানুষেরা সন্দেহ করেছে। শুধু সন্দেহ নয়, তার চরিত্র নিয়ে কথা উঠেছে। তার বড় মেয়ে বেলারানি ও ছোটো মেয়ে পরিবালা দুজনেই বিক্রি হয়ে গেছে। মেয়ে পাচারের কারবারে নিযুক্ত মোহন আউলচাঁদের (গিরিবালার স্বামী) মেয়ে দুটিকে পাচার করেছে। "মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বত্র চলছে কারবার। এসে কয়েকশো টাকা দেয়। . . . থানা পুলিশ ছেঁড়া মামলা নেবে না। বলে দেবে, বাপ মেয়ের বিয়ে দিলে থানা কি করবে?"[৫] এত সবকিছুর পরেও যে টাউনে গিরিবালা তার ছোটো মেয়ে মরুনিকে নিয়ে চলে যায়, সেই টাউনেই পরি নিখোঁজ হয়েছে। পাচার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের কাছে আলোচনা না করে ও কাউকে না জানিয়ে চলে যাওয়া- ঘটনা দুটি গ্রামবাসীদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকেছে। সেজন্য তারা গিরির নামেই নিন্দে করেছে। গিরি মেয়েটিই আসলে 'মন্দ'। আসলে প্রত্যেক গল্পে জন্মের একটা সত্য থাকে। একটা বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করে গল্পকার চেষ্টা করেন তাঁর দার্শনিকবোধকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। গিরিবালা মেয়েটি কেমন ও তার চরিত্রে 'মন্দে'র দোষ লাগার কারণটি খুবই বৈপরীত্যে ভরা। চার কুড়ি টাকা পণ দিয়ে আউলচাঁদ গিরিবালাকে তার স্ত্রী রূপে এনেছে। গিরিবালার বয়স তখন ছিল চোদ্দ বছর। আনার পর স্বামীর দিনরাত সহযোগী হয়ে নিজেদের একটা টিনের ঘর তুলতে পেরেছিল। মেয়েটি ভারি 'কাজ পাগল'[৬] বটে। কাজও খুব 'পরিষ্কার'[৭]। গিরি খুব ব্যক্তিত্বেরও অধিকারী। কেঁদে কেটে গিরি তার বাপের কাছে কিছু পয়সা আর এক মন চাল আদায় করে নিতে পারত, কিন্তু সে তা করেনি। নিশিন্দা সাব-পোস্ট অফিসের পিয়ন বংশী ধামালি গিরিকে বহরমপুরের কোনো এক ডাক্তারের বাড়িতে কাজ দেবার কথা বললে গিরির সবকিছু 'স্বপ্ন' ও 'অলীক' বলে মনে হয়েছে। "ঘর হচ্ছে, জমিও হতে পারে। স্বামী তার অত্যন্ত বাউন্ডুলে তা সে জানে। তবুও স্বামীর উপর অপার মমতা হচ্ছিল তার।"[৮] পতিভক্তি গিরির বরাবর আছে। অবশ্য তার স্বামী আউলচাঁদ গিরির চুলের মুঠি ধরে 'এই মারে তো সেই মারে'।[৯] তবু স্বামীর উপর তার অগাধ আস্থা আছে। সেজন্যই তো আউলচাঁদ যখন তার বড় মেয়ে বেলারানির বিয়ের কথা তুলেছে, তখন গিরি ছেলের খোঁজ করতে বলে পরিবালাকে নিয়ে বাপের বাড়ি ঘুরতে গেছে। এমনকি বড় মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়ার পরেও সে তার স্বামীর মুখের উপর কোনো জবাব দিতে পারেনি। গিরির প্রতিক্রিয়া:

> "গিরি দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ করে থাকে। চোখ বুজে থাকে সে। বড় দুঃখে তার মনে সত্যি কথার ঝিলিক জাগে...।"[১০]

গিরির 'দেয়ালে ঠেস' দিয়ে চুপ করে বসে থাকাটা তার অসহায়তাকে তুলে ধরেছে। মেয়েসন্তানকে নিয়ে গ্রামবাসীরা এত ভাবতে চায়নি। তাদের কাছে এ যেন অদৃষ্টের লিখন। গিরিবালার লিখন এখানেই যে, সে অসহায়! কিন্তু সে তো বাপের বাড়ির আদর পেয়েছে। খুব খাওয়া ও খুব যত্নও পেয়েছে। "একটু আরামেই যেন স্বর্গসুখ পাচ্ছিল সে।"[১১] আসলে গিরি তার সন্তানদের ভালো চেয়েছে। সে মেয়েদের ভালো ঘরে বিয়ে দেওয়া ও ছেলেমেয়ে যাতে শহরের স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে সেই স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু তার এই স্বপ্ন বারবার স্বামী নামে আইডিয়ল মানুষটিকে ঘিরেই থেকেছে। সে বুঝতে পেরেছে তার স্বামী "বাউণ্ডুলে"[১২]। বাবা হয়েও সে তার মেয়েকে "বিয়ের ভুজুং"[১৩] করে চালান করেছে। তবু গিরি পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে। গিরি শুধু নিজের জীবন নয়। তার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করে

তুলতে চেয়েছে। কারণ দারিদ্র্য তার বেষ্টনী। আর এসবের মাঝে থেকে গেছে সামাজিক বচন। গিরি এই বচন পেয়েছে সমাজ অভ্যন্তরে বসবাস করেই। সমাজে থেকে সমাজকে অস্বীকার করতে পারেনি গিরিবালা।

দু-দুটো মেয়েকে পাচার করে আউলচাঁদ যে টাকা পেয়েছে, সেই টাকা দিয়ে গিরি মনের মতো করে ঘর তুলেছে। "গিরি তার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। চেয়েই থেকে। আউল চাঁদ মনে মনে বোঝে, যত দুঃখ পাক ঘরটি নিশ্চয়ই মনে ধরেছে।"[১৪] ঘরের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকা গিরি সংযোগ রচনা করতে চেয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে যে, তার বাপের কাছ থেকে বাঁশ নিয়ে ঘর তুললে হয়তো মেয়েদের আজ এই পরিস্থিতি হত না। সামাজিক বচনের ঘেরাটোপে না আটকে থাকলে সে বেলারানি ও পরিবালাকেও রক্ষা করে রাখতে পারত। গিরি থেমে থাকেনি। সবাই "অবাক"[১৫] হয়ে দেখেছে যে, গিরিবালা ভোর রাতে মেয়ে মরুনিকে কোলে নিয়ে রাজীবের (গিরির নিজের ছেলে) হাত ধরে টাউনে চলে গেছে। গিরিবালা গর্জে উঠতে পারেনি সামাজিক বচনের বিরুদ্ধে। তবে তার টাউনে চলে যাওয়া এক তীব্র কষাঘাত। যাবার আগে সে বংশী ধামালিকে বলে গেছে যে, পরির বাবাকে বলে দিতে যে, সে যেন তার ঘরে "জন্ম জন্ম"[১৬] বাস করে। "গিরি টাউনে ঝি খাটবে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করবে।"[১৭] গিরির এই প্রতিবাদ তার একার। সমস্ত গ্রামবাসী তার আচরণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। একথা জেনে সবাই অবাক হয়ে গেছে। "বেলা আর পরির যা হয়েছে, সে তো এখন ঘরে ঘরে হচ্ছে। তা বলে স্বামী ছেড়ে চলে যায় কে? কোন্ মেয়েছেলে ?"[১৮] এই 'মেয়েছেলে' শব্দবন্ধনটি পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতায়নের দিকটিকে মেলে ধরেছে। বেলা ও পরির পাচার কারবার গ্রামের মানুষ মেনে নিয়েছে। সামাজিক বচনের চক্রব্যূহ থেকে গিরি বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেও কথাকার চক্রপথে নারীর ঐতিহ্যলালিত সংস্কারকে মেনে নিয়েছেন। তবে এই সংস্কৃতির মধ্যে থেকেও গিরির একক সংগ্রাম তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে সূচিত করেছে। "আইবুড়ো মেয়ে বাপের সম্পত্তি।"[১৯] না, গিরিবালা সে। এটাই তার পরিচয়। সে আর আউলচাঁদের স্ত্রী নয়। গ্রামের সামান্য মেয়ে নয়। গিরির যাত্রা তার আত্মসম্মানের পরিচয়কে মেলে ধরেছে। "তবু সে হেঁটে চলল।"[২০] তাকে হাঁটতেই হবে, হয়েছেও। প্রকৃত প্রস্তুতি নিয়েই গল্পকার হেঁটেছেন তাঁর লিখনশৈলীর উপর ভর দিয়ে। এই লিখন গ্রামের মেয়ে গিরিকে 'গিরিবালা' করে তুলেছে।

"আমি বাঁয়েন লই গো, বাঁয়েন লই!"[২১]- 'বাঁয়েন' গল্পের এই বাক্যের কাতরতা দিগন্তব্যাপী। এই বাঁয়েনকে পোড়ানো যায় না। তাকে মারা যায় না। তাকে মেরে ফেললে গ্রামের ছেলেপিলে বাঁচে না। তার চলাফেরাটাও গণ্ডীবদ্ধ। মানুষের যুক্তিবোধ যেখানে এসে থমকে দাঁড়ায়, সেখান থেকেই শুরু হয় অলৌকিক জগতের যাত্রাপথ। তা পুরোপুরি অদৃশ্য। বাঁয়েনের এই উক্তি তার স্বভাবের দিকটিকে তুলে ধরেছে। সে নিজেও জানে যে, তার দৃষ্টি বড়ই "ক্ষুধিত।"[২২] তার ছায়াতেও ছোটো ছেলের শরীরে "ক্ষতি"[২৩] হয়ে যায়। সেজন্যই তো মলিন্দরের ছেলে ভগীরথ মজা বিলের ধারে তার কাছে নিস্তব্ধ দুপুরে গিয়ে কথা বলতে চাইলে বাঁয়েন নিজেই তা বারণ করেছে। "...বাঁয়েনের ধারে কুনদিন আসবে না...।"[২৪] এই যে বাঁয়েনের আত্মোপলব্ধি সেটা সংস্কৃতি নির্মিত বয়ান, যে বয়ান মানুষকে তার নিজের সম্বন্ধে সমাজের কাছে প্রতিনিয়তই পরিচিত করে চলে। আর এখানেই পাঠক চিত্তকে হোঁচট খেতে হয়েছে। বাঁয়েনের নিজেকে বারবার 'বাঁয়েন' না বলা, অন্যদিকে ভগীরথের কাছে নিজেকেই 'বাঁয়েন' রূপে সম্বোধন করা-এই দু'য়ের বৈপরীত্যে গল্পকাহিনি দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বাঁয়েনের নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াস গল্পের ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। মলিন্দর অঞ্চলের শ্মশানের শিক্ষিত ডোম। নাম সই করতে পারে। মহকুমার লাশ ঘরে বিয়াল্লিশ টাকা মাইনের কাজ পেয়েছে। গোটা মানুষের হাড় নয়তো খুলি চুন আর ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পচিয়ে বের করে। হবু ডাক্তারদের কাছে খুলি হাড়-কঙ্কাল মোটা লাভে বেচে দেয়। পাড়ার সে "সম্মানী"[২৫] মানুষ। বহু বছর

আগে ভগীরথের বাবা মলিন্দরের এক জ্ঞাতি বোনকে নিয়ে তার স্ত্রী চন্ডী শীতলাতলায় পুজো দিতে গেলে সে বোন মারা যায়। এই ঘটনাটি চন্ডীকে 'বাঁয়েন' রূপে চেনাতে শুরু করেছিল। এই চন্ডীকেই মলিন্দর নিজে ঢোল পিটিয়ে পিটিয়ে "বাঁয়েন হয়্যাছে"[২৬] বলে চিৎকার করে ঘোষণা করেছিল। চণ্ডীর এই 'বাঁয়েন' হবার পেছনে দায়ী থেকেছে তার বংশের পিতৃপুরুষের কাজ! এই কাজ তাদের বংশের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে। তারা বংশগত কাঁচা ভাগাড়ের কাজ করত। পাঁচ বছরের নিচে যে সমস্ত শিশু মরে তাদেরকে উত্তর বিলের ধারে বটগাছ তলায় পুঁতে দেওয়া হত। সেই ভাগাড়েই চন্ডীর বাবা খন্ত দিয়ে গর্ত খুঁড়ত, কাটা গাছ দিয়ে গর্ত ঢেকে রাখত, যাতে শিয়াল উৎপাত না করে। তার বাবার এই পেশা মেয়ে হয়েও চন্ডী গ্রহণ করেছিল:

> "...কিন্তু মরাকে কি কেউ বাড়িতে ধরে রাখে, না রাখতে পারে? তার সৎকার করাটা তো চন্ডীর কাজ। ওর জীবিকা। এতে ভয়ের কী আছে, নিষ্ঠুরতাই বা কি?"[২৭]

এই চন্ডীকেই মলিন্দর বিয়ে করেছিল। তবে চন্ডীর সংসারে মন টিকত না। কারণ সেই মানুষটির বংশের একজন হয়ে চণ্ডী তার জাতকর্ম ছাড়তে চায়নি। চণ্ডীর এই আর্থিক স্বনির্ভরতা তার বংশগত ঐতিহ্যকে বহন করেছে। সে স্বনির্ভর হতে চেয়েছে। "গঙ্গাপুত্র"[২৮] বলে পরিচিত হলেও সে পূর্বপুরুষের কাজের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়েছে। কেননা তারা যে আদিম যুগের "শ্মশানের দাস।"[২৯] পূর্বপুরুষদের সেই কাজকে চন্ডী বহন করে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমনকি পুত্র ভগীরথের প্রতি তার মমত্ববোধ এসবের মধ্যেও অটুট থেকেছিল:

> "যদি বটতলায় বেশি সময় থাকতে হয়, ওর বুকে দুধ টনটন করে। মুখ নিচু করে ও গর্ত খোঁড়ে ও বাপকে মনে মনে দোষ দেয়। মেয়েকে কেন সে এই নিষ্ঠুর কাজে ব্রতী করে গেল?"[৩০]

অর্থাৎ বংশপুরুষের ঐতিহ্যপ্রসূত কাজ ও তার ছেলের প্রতি বাৎসল্যবোধ তাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিয়েছে। বাপের কাজকে 'নিষ্ঠুর' (নিজেই বলেছে) বলা তার মনকেও দ্বিধাগ্রস্ত করেছে। সত্তার এই দ্বিমুখীনতায় তার মন হয়েছে ক্লান্ত। বংশগত পেশা ও সন্তান বাৎসল্য- এই দু'ইয়ের দ্বন্দ্বে চণ্ডীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। গ্রামীণ সমাজের নিজের তৈরি সংবিধানকে সে উপেক্ষা করতে পারে না, করেনি। তবু যথাপ্রাপ্ত স্থিতাবস্থাকে অটুট রাখার জন্য তার নিরন্তর প্রয়াস চলেছে।

তবু গ্রামবাসীদের কথা শুনে ও নিজের উপর বাঁয়েনের অপবাদ শুনে সে এই কাজ ছাড়তে চেয়েছিল। "পিতৃপুরুষের শাপ মোকে লাগুক, ডর করি না। উ কাজ ছেড়ে দিলাম আজ হতে।"[৩১] তবে শেষ রক্ষা হয়নি। তাকে 'বাঁয়েন' রূপেই চেনানো হয়েছে। এই 'বাঁয়েন'ই প্রমাণ করেছে যে সে 'বাঁয়েন' নয়। সে সাধারণ এক গ্রাম্য নারী। রেললাইনের উপর বাঁশ সরাতে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে। গল্পকার প্রশ্ন তুলেছেন: "ও যদি বাঁয়েন হয় তো ওর পোষা অন্ধকারের দানবগুলো এসে এ ট্রেনটাকে থামিয়ে দিচ্ছে না কেন? সমাজ তো এই পারে।"[৩২] এই প্রথম সে বুঝতে পেরেছে যে, সে বাঁয়েন নয়। রক্ত মাংসের সাধারণ মানুষ। তার ক্ষমতা নেই লাইনের নিজের 'পোষা অন্ধকারের দানবগুলোকে' ডেকে এনে লাইনের উপর থেকে বাঁশ তুলে ফেলা, যাতে করে রেলের যাত্রীদের কোনো ক্ষতি না হয়। রেললাইন থেকে বাঁশ তুলে সে প্রমাণ করেছে সে সাধারণ মানুষ। তার মৃত্যু ঘটেছে। রেল কোম্পানি 'বাঁয়েনকে' এই কাজের জন্য মেডেল দিতে গেলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ তাকে "জ্ঞাতি"[৩৩] বলে সম্বোধন করেছে। এই প্রথম সে জ্ঞাতি লোকের কাছ থেকে সম্মান পেয়েছে! না, তার এই সম্মান তার জাতির সম্মান। তার কাজের প্রতি সম্মান করা নয়। কেননা রেল কোম্পানি তাকে মেডেল দেওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের জ্ঞাতির কাছ থেকে কোনোরকম সম্মান সে পায়নি।

তবু একথাটা অস্বীকার করা যায় না যে, সমাজের সদস্যদের চণ্ডীকে 'জ্ঞাতি' সম্মানে গ্রহণ করার মধ্যে সে অর্জন করে নিতে পেরেছে তার নিজের জীবনের অর্থ। তার মানবিক কাজ তাকে সামাজিক সম্পর্কের চিরাচরিত কাঠামোয় এনে দিয়েছে। মায়ের ইতিহাস পরম্পরার পেশাকেই পুত্র ভগীরথ দুহাত তুলে সম্মান দিয়েছে। শুধুমাত্র পিতৃপরিচয়ে আবদ্ধ না থেকে ভগীরথ মা চণ্ডীর পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছে: "...মা ঈশ্বর চণ্ডী গঙ্গাদাসী.....।"[৩৪] সমাজ প্রদত্ত পিতৃপরিচয়ের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে মায়ের পরিচয়ে পরিচিত হতে চাওয়া এই গল্প হল চণ্ডীর আত্মকথার একটি লিখিত সংবিধান। চণ্ডীর সামাজিক সত্তা পুত্র সকলকে বুঝিয়েছে। এখানেই চণ্ডীর সংগ্রাম সমাজের সঙ্গে, নিজের সঙ্গেও। তার এই সংগ্রাম পুত্রের চরিত্রে অঙ্গীভূত হয়েছে।

'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে জটির অস্তিত্ব তার বংশের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একটু আগেই 'বাঁয়েন' গল্পে দেখেছি যে, চণ্ডী তার জাতকর্মকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। নিজের কুল থেকে বেরিয়ে আসতে তাকে হারাতে হয়েছিল তার আত্মপরিচয়। 'সাঁঝ-সকালের মা' গল্পে জটিরা পাখমারা সম্প্রদায়। তাদের সমাজ পাখি শিকার করে। তারা জরা ব্যাধের বংশধর। তারা "মহাপাপীর"[৩৫] সমাজ। স্বজাতেই তাদের বিয়ে করতে হয়। এটাই তাদের বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তদের ধর্মানুসারে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ওদের সমাজের প্রতিটি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় দেবতার সঙ্গে। দৈববাণীতে ওদেরকে সমাজ না ছাড়ার কথা ঘোষিত হয়েছিল। কেননা তারা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে বাণ মেরেছিল। কুলের মধ্যে থেকেই তাদের সমাজের প্রতিটি মেয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে চিনতে শিখেছে। কিন্তু জটি তার ছেলে সাধনকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বলে গেছে তারা "জেতে বড়, অ্যানেক বড়।"[৩৬] জটির এই মন্তব্য ও তার নিজের জাতির পরিচয় দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে। তামাটে রং, নীল চোখ, কটা চুলের অধিকারিণী জটিকে বিয়ে করেছে উৎসব কান্দোরী। উৎসব চিকন পাটি বোনে। সে মনে মনে জানে, তাদের জাত পাখমারাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। সে শহরে মজুর খাটতে যায়। সে জটিকে বলেছে: "এখন তুমি জাতে উঠেছ, শ্রেণী বদলিয়েছ।"[৩৭] উৎসব তাকে বলেছে কীভাবে জাতে উঠতে হয়। আর তার এই জাতে ওঠার বিষয়টি জটির দুঃখের কারণ হয়েছে। তার সমাজ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। জটির আশংকা সত্যি হয়েছে। "চিরঅভিশপ্ত ওরা, ঈশ্বরকে যারা হত্যা করে গোড়ালিতে বাণ মেরে, তাদের বুঝি ঘুরে ঘুরেই জীবন শেষ করতে হয়।"[৩৮] জটির ভাগ্যে সেটাই হয়েছে। তার স্বামী মরেছে। জটির ধারণা পিতামহীর বাণেই উৎসব মরেছে। সে বুঝেছে, তার বিয়ে করাটা ভগবান মেনে নেয়নি। "পাপ"[৩৯] হয়েছে। জটি যে উৎসবের হাত ধরে নিজের কুল পরিচয়কে অতিক্রম করতে চেয়েছে, তাতে তারই ক্ষতি হয়ে গেছে। তার এই ক্ষতি শুধু বিধাতার লিখন নয়। সত্তার গভীরে লুকিয়ে আছে তার ভাগ্যের চোরাবালির ইতিহাস। যা তার জন্মানোর মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। গল্পের বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল জটি যখন অনেক রূপ, অনেক স্বাস্থ্য ও অনেক যৌবন নিয়ে সংসারের বাইরে পা বাড়িয়েছে। সমাজের সংকটদীর্ণ চেহারা বুঝেই বিজ্ঞের মতো এক সন্ন্যাসী জটিকে পরামর্শ দিয়েছে শুধু একখানা কাপড় ও লাল ত্রিশূল ধারণ করতে। সাংস্কৃতিক মানদণ্ডকে সন্ন্যাসী বেশ ভালোই বুঝেছে বলে সে জটিকে তার জীবন ধারণের উপায় বাতলে দিয়েছে। জটিও বুঝেছে যে, "ঠাকুরনি"[৪০] না হলে সে তার তিরিশ বছর বয়সি হাবাগোবা ছেলেকে বাঁচাতে পারত না। নিজেকেও বাঁচাতে পারত না মানুষের নজর থেকে। জটি তার সম্ভাব্য জটিল জীবনে ধর্মকেই ঘিরে ধরেছে। সে বুঝেছে যে, সাংস্কৃতিক প্রতাপ-ই পারে তার ছেলের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে। সেজন্য সে ছেলের উদ্দেশে উচ্চারণ করেছে তার পরিকল্পিত বয়ান:

> "'মা বলে ডাক্যে না বাপ, বাপো আমার।'.... লা বাপো, খুব বিয়েনবেলা, সুয্যি না উঠতে মা বলে ডেকে লিবি। সুয্যি ডুবতে মা বলে ডাকবি।"[৪১]

নতুন এক আখ্যানের আকল্প সে হয়ে উঠতে পারত কিন্তু সময় তাকে হতে দেয়নি। সমাজ জীবনের নিরুচ্চার চিহ্নগুলিকে জটি তার অস্তিত্বের জন্য ধারণ করে নিলেও তাকে মৃত্যুপথযাত্রী হতে হয়েছে। আবার এখানেই সে জন্ম দিয়ে গেছে তার নতুন সামাজিক সত্তার: "সকলের মনে মহা কৌতূহল। সাধনের মাটির উঠোনে পাড়া-পড়শির ভিড়।"[৪২] সমাজের কাছে জটি এইসময়ে তার নতুন অভিধা প্রাপ্ত হয়েছে। সে তার উৎসব কান্দোরীর পরিচয় ত্যাগ করে জনমানসে 'ঠাকুরনি' হয়ে উঠেছে। চিরাচরিত অলৌকিকতাকে নিজের শরীরে ধারণ করার ফলে তার অস্তিত্ব সমাজ দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। তাই এত 'ভিড়'। যে জটিকে উৎসব জাতে তুলতে চেয়েছিল, সেই জটিই সংগ্রাম করেছে তার ছেলের জন্য। ফলে পূর্বনির্দিষ্ট কেন্দ্রীভূত প্রতাপের বিরুদ্ধে সে তার সংগ্রাম ছেলে সাধনের রক্তের ভেতরেও ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। জটির শ্রাদ্ধ করতে দেওয়া চাল ব্রাহ্মণ নিতে চাইলেও তিরিশ বছরের হাবাগোবা ছেলেটি চেঁচিয়ে ওঠে: "ঘরে কানাকড়ি লাই যে চাল কিনে আধব।... চাল আমার!"[৪৩] এই চালেই সাধন তার মাকে খুঁজে নিতে চেয়েছে। পাখমারা সম্প্রদায়ের পরিসরে বন্দি না থেকে জটির ছেলেও সময় সচেতন হয়ে উঠেছে।

কথাকারের সৃষ্ট গল্পগুলিতে নারীর অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। কারণ নারী তার আশেপাশে গড়ে ওঠা সমাজের সূক্ষ্ম বয়ানগুলিকে চিনতে শিখেছে। 'ধৌলী' ও 'রুদালী' ছোটোগল্প দুটি সেসবের দৃষ্টান্ত বহন করেছে। 'ধৌলী' গল্পের শুরুতেই ধৌলী পারশনাথের মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কারোর জন্যে অপেক্ষা করেছে। সে ভেবে পায় না ও "কী করবে।"[৪৪] নিশ্চয়ই এমন কিছু সংকেত দ্যোতিত হতে চলেছে, যা তার জীবনকে নাড়া দিয়েছে। কারণ তার মা পর্যন্ত সামাজিক বচনকে উপেক্ষা করে থাকতে পারেনি। তার সঙ্গে তার মায়ের কথোপকথনের কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হল:

"ধৌলী— তোহর গলৎ। স্বামী মরে যেতে শ্বশুরালে ফেলে রেখে দিতিস, যা হবার হত।
ধৌলীর মা— তারা কি রাখল? তুইও চলে এলি।
ধৌলী— ধরম রাখত না ভাশুর।
ধৌলীর মা— মিশ্রিলাল রাখল। ধৌলীর বুকে তির বেঁধে গেল।"[৪৫]

বোঝা যাচ্ছে যে, দুসাদের মেয়ে ধৌলি বিধবা। সে জন্মদুখীও বটে। কারণ শ্বশুর বাড়িতে তার জায়গা হয়নি। বরটা ভালো ছিল না। তাকে মারত। তার বাবাও জমিদারদের ধার শোধ করতে করতে মরে যায়। শৈশবে পিতা ও যৌবনে স্বামীর দ্বারা রক্ষা করার সামাজিক দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। সে স্বাধীন! তার এই স্বাধীনতা তাকে নিয়ে গেছে তারই অস্তিত্বের কান্নায়। দারিদ্র্য, অনাহার আর হাড়ভাঙা খাটুনি এই হয়েছে তার জীবন। জীবনের শখ-আহ্লাদ থেকে হয়েছে সে বঞ্চিত। কারণ সে যে বিধবা। তাকে আয়নায় যে মুখ দেখতে নেই। গালার চুরি পরতে নেই। পরতে নেই কোনো সিঁদুরের ফোঁটা। যদিওবা সে এই বিধবা সমাজ অনুশাসনের দিকটি অবহেলা করে প্রেম করে বসেছে। শুধু প্রেম নয়, বিয়েও করেছে মিশ্র পরিবারের কর্তা বুরুডিহার হনুমান মিশ্রের ছেলে মিশ্রিলালকে। আর সেকারণেই তো সামাজিক প্রতাপ তার ছায়া ছাড়েনি। এই প্রতাপ তার মায়ের কণ্ঠেও ভেসে এসেছে। হনুমান মিশ্রের চোখে তার ছেলে বংশের "কলঙ্ক।"[৪৬] মিশ্রিলালের মায়ের মতেও সে "দোষ"[৪৭] করেছে ও "ব্রাহ্মণ দেওতার ঘর নষ্ট"[৪৮] করেছে। প্রতাপের এই কণ্ঠস্বরে নিমজ্জিত হয়েছে দুসাদদের সমাজও। যে কোনো সৃষ্টিশীল লেখক সমাজকে অস্বীকার করতে পারেন না। সমাজের বাস্তবতাকে অবলম্বন করেই থাকে তাঁর শিল্প নির্মাণ। দুসাদ সমাজ "নজর"[৪৯] রেখেছে তার উপর। কারণ সে স্ব সমাজের ছেলেদের আমল দেয়নি। সমাজের মতে, এক্ষেত্রে ধৌলী স্বেচ্ছায় এগিয়ে গেছে যা "অমার্জনীয় অপরাধ।"[৫০] "দুসাদ মেয়েকে ব্রাহ্মণের ছেলে কি এই প্রথম নষ্ট করল? গ্রাম সমাজের বিচারে সব দোষ ধৌলীর।"[৫১] এই সমাজ খুবই সংবেদনশীল! ব্রাহ্মণ সমাজ ও দুসাদ সমাজ তথা

তার নিজের সমাজ-এই দুই সমাজের কাছেই সে 'নষ্ট' ও 'অপরাধ' তার নিজের। দুই ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়েও ধৌলী এগিয়েছে, যতটা তার এগোনোর কথা। সে আত্মহত্যার কথা ভেবেছে, কিন্তু পারেনি। "বেইমানের"[৫২] মুখ না দেখে সে আত্মহত্যা করতে চায়নি। হ্যাঁ, স্বামী নামের পাঠকল্পে সে আর আস্থা রাখতে চায়নি। কেননা মিশ্রিলাল এসেছে, তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আবার প্রতিশ্রুতি ভেঙে বিয়েও করেছে অন্য মেয়েকে। জীবন যখন যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে প্রতিটি স্তরে যুদ্ধের শেষ নেই। ধৌলী সে যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধ করেছে সমাজের সঙ্গে। সে নিজে কাজ করে সমাজে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। শুধুমাত্র ছেলের জন্য। কারণ সে বুঝেছে: "ও মরলে মাকে গ্রামসমাজ দেখবে কিন্তু বাচ্চাটা?"[৫৩] সম্ভাব্য উত্তরের আশায় সে পথ বাঁধতে চায়নি নিজের। সে বুঝেছে যে, সে মরলে তার মা পারলে তার ছেলেকে বাঁচাবে নয়তো সেও মরবে। বাক্যের এই উচ্চারণ আপতিক সিদ্ধান্ত নয়। এর সঙ্গে মিশে আছে অলিখিত সংবিধান। যে সংবিধানে সমাজে ছেলেকে তার পিতার পরিচয়ে পরিচিত করে তোলা হয়। ধৌলীর বাস্তববুদ্ধি ব্যাপ্ত হয়েছে নবজাগ্রত শিশুর মুক্তি চেতনায়। ধৌলী "রাণ্ডী"[৫৪] হয়েছে। সে বেঁচে থাকার পথ চিনেছে। পঞ্চায়েতের সভায় স্থির হয়েছে যে, তাকে গ্রাম থেকে বাইরে বের করে দিতে হবে। কারণ "গ্রামের বুকে বসে এত বড়ো অধর্ম সে চালাতে পারবে না।"[৫৫] সমাজ মতে, ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে তার 'পাপের' দায় ধৌলী নিজেই। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় দুসাদের মেয়ে ধৌলী প্রান্তকায়িত হয়ে পড়েছে। অধঃপতিত বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তাকে গ্রাম ছাড়া হতে হয়েছে। তবে অস্তিত্বকে চিন্তার কেন্দ্রে প্রতিস্থাপন করার ফলে তার ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক-সত্তার সূক্ষ্ম অনুরণন নিজস্ব গতিবেগ পেতে চেয়েছে। মিশ্রিলালের সঙ্গে তার কথোপকথনে এই ব্যক্তি সত্তার রূপটি ধরা পড়েছে:

"মিশ্রিলাল— তুই রাণ্ডী হয়েছিস?
ধৌলী— জরুর।
মিশ্রিলাল— কেন হলি?
ধৌলী— তুমি মজা লুটে পালালে। তোমার দাদা ভাতে মারল। তোমার ছেলেকে বাঁচাতে, ঔর নিজে বাঁচতে।
মিশ্রিলাল— এর চেয়ে তুই মরলি না কেন?
ধৌলী— মরতে গিয়েছিলাম। তারপর ভাবলাম, কেন মরব? তুমি সাদী করবে, দুকান চালাবে, দুলহনিয়া নিয়ে সিনেমা দেখবে, মরব আমি? কেন? কেন? কেন?"[৫৬]

রাণ্ডী হবার সত্তাকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে মিশ্রিলালের 'কেন হলি?' প্রশ্নের আধিপত্যবাদী দম্ভের কাছে সে নতি স্বীকার করতে চায়নি। এর এখানেই ধৌলী আলাদা হয়েছে। সে সংগ্রাম করেছে অনুশীলিত আগ্রাসী দম্ভের বিরুদ্ধে। সে মরবে না। কিছুতেই সে মরতে চায় না। তার সামগ্রিক অস্তিত্ব সমাজ সত্তার কাছে দায়বদ্ধ থেকেছে। 'কেন? কেন? কেন?'- তিনটি 'কেন'-র উচ্চারণ তার স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে চেয়েছে। সমাজ বাস্তবতা হল অস্তিত্ব হয়ে ওঠার যোগদানের একটি বিশেষ ধরণ। আমরা সমাজে কে, কীভাবে যোগ দিচ্ছি, তার উপর নির্ভর করেই জেগে ওঠে সামাজিক সত্তা। ব্যক্তির চেয়ে সমাজের শক্তির অনেক বেশি তা ধৌলী প্রমাণ করে দিয়েছে। নারী তার সংগ্রাম চালিয়েছে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। পিতৃতন্ত্রের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে। নারী দেহের জৈবিক চিহ্নকে সে করে তুলেছে সামাজিক সত্তার মাধ্যম। গল্পকার ধৌলীর সংগ্রামকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তার সামাজিক সত্তায়; "সবচেয়ে শক্তিমান তারা।"[৫৭]

"বাস, লাইন ধরিয়ে দিলাম, এখন লড়ে যা।"[৫৮]- এই লড়ে যাওয়ার কাহিনি হল 'রুদালী' ছোটোগল্প। মালিক মহাজন মরলে রুদালীরা আসে কাঁদতে। রুদালীদের এই কারবার পেশাদারী কারবার। এই

কারবারের জন্য বড় বড় শহরের পেশাদারী বেশ্যারা পর্যন্ত লড়ে যায়। জমিদার ভৈরব সিংয়ের মৃত্যুতে শনিচরী কেঁদেছে। তার সুনাম হয়েছে। ভৈরব সিংয়ের মৃত্যুযাত্রায় যারা কেঁদেছিল তাদের আনাটা যেন গল্পের অন্যান্য জমিদারদের "মান"[৫৯]-এর লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাথুনি সিংয়ের মায়ের মৃত্যুতে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। মরে গেলে ধুমধাম করে ক্রিয়ার কাজ করে তাদের 'মান' উঠবে। নাথুনের মেজো বউ তার বাপের মৃত্যুর পর দেখিয়ে দিতে চেয়েছে তাদের ধনগৌরব: "আমার বাপের দাহ ঔর কিরিয়া এমন হবে, যে গল্প রয়ে যাবে মুল্লুকে।"[৬০] জমিদারদের মান রক্ষার পালা এমন পর্যায়ে গেছে যে, গম্ভীর সিং তার নিজের চিকিৎসা করাতে চায়নি। তার গোমস্তার সঙ্গে কথা বলে রুদালী জানতে পেরেছে যে, গম্ভীর সিং শুক্লপক্ষে মরতে চায়। তার মতে, শুক্লপক্ষে মরলে "সিধে বৈকণ্ঠ"।[৬১] আর কৃষ্ণপক্ষে যুধিষ্ঠিরের মতো প্রথমে "নরক"[৬২] দর্শন তারপরে "স্বর্গ"[৬৩] বাস। তার বান্ধবী বিখনির মৃত্যুতেও শনিচরী শোকতপ্ত হয়েছে তবু কাঁদেনি। কারণ পয়সা, চাল, নতুন কাপড় না পেলে কাঁদাটা তার কাছে "বাজে বিলাসিতা।"[৬৪] দুলন বলেছে, রান্ডী ডেকে কাঁদানো এক মজার খেলা। মালিক মহাজনের টাকা "পাপের টাকা। তার রয় ক্ষয় নেই।"[৬৫] রুদালী পাপ-পুণ্যের হিসেব করতে গেলে দুলন তাকে অত পাপ-পুণ্য না বিচার করার কথা শুনিয়েছে। তার মতে, পাপ-পুণ্য "মালিকদের এক্তিয়ারের জিনিস। ওরাই সে হিসেবে ভাল বোঝে। তুই আমি বুঝি খিদের হিসাব।"[৬৬] পেটের হিসেব সবচেয়ে বড় হিসেব। শ্বাশুড়ি, ভাশুর, জা- এই তিনটে মৃত্যুর পর সে ব্যস্ত থেকে গেছে। কাঁদতে সে সময় পায়নি। এই ব্যস্ততা তার নিজের সংসারকে ধরে রাখার ব্যস্ততা। প্রত্যেক মৃত্যুর সময়কালীন ঘরের অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হল:

১) শাশুড়ির মৃত্যুর সময়: "ঘরে নেই এক খুঁচি গম। প্রায়শ্চিত্তের কড়ি আসবে কোত্থেকে?"[৬৭]

২) ভাশুর ও জায়ের মৃত্যুর সময়: তার গ্রামের মালিক মহাজন রামাবতার সিং। গ্রামের সংখ্যাগুরু দুসাদ ও গঞ্জুদের গ্রাম থেকে তাড়াবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই ভয়ে শনিচরী কাঁটা হয়ে থাকতো। "কাঁদবে, না লাশ জ্বালাবার, সস্তায় শ্রাদ্ধ সারবার কথা ভাববে?"[৬৮]

৩) স্বামীর মৃত্যুর পর: স্বামীর শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে শনিচরীকে ব্রাহ্মণ মোহনলালকে সন্তুষ্ট করতে হয়েছে কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে। এর জন্য ধারে সে ক্ষেতে বেগার খাটার বিনিময়ে রামাবতার সিংয়ের কাছে কুড়ি টাকা ধার করেছে। সেবারেও সে কাঁদতে পায়নি।

৪) ছেলের মৃত্যুর সময়: সে এক বৈদ্যের কাছে গিয়েছে ওষুধ চাইতে। বৈদ্য তাকে 'ছোট জাত'[৬৯] বলে ওষুধ দেয়নি। ছেলের বউটাও পালিয়ে গিয়েছিল। বউমা পালাবার 'কেচ্ছা'[৭০] চাপা দিতে ছোটাছুটি করতে গিয়ে ছেলের জন্যও সে কাঁদতে সময় পায়নি।

আর্থ-সামাজিকভাবে মার খেতে খেতে তবেই না শনিচরী নেমেছে রোজগারের পথে। জমিদারদের মৃত্যুর পর কান্নার জন্য শনিচরী রুদালীর কাজ গ্রহণ করেছে। দুসাদ জাতের একজন ঘরের বধু শনিচরী নিজের পরিচয়কে সমাজের সামনে মেলে ধরেছে। সে নিজে গেছে শহরে রান্ডী জোগাড় করতে। শত শত বেশ্যারা তাকে "হুজরাইন"[৭১] বলে সম্মান জানিয়েছে। শুধু নিজের পরিচয় নয়। সে আরও শত শত রান্ডীর সম্মানকে ফিরিয়ে এনেছে। গম্ভীর সিংয়ের বাধা রান্ডী মোতিয়া। তার মেয়ে গুলবদনকে বিয়ে দেবার কথা বলেছিল গম্ভীর সিং। কিন্তু দেখা গেছে, তার ভাতিজা সেই কথা শোনেনি। ভাতিজার নিজের মায়ের মৃত্যুর পর সে গুলবদনকে বলেছিল, "রান্ডীর মেয়ে তোর ভাতের অভাব কি ?"[৭২] সেই গুলবদন গম্ভীর সিংয়ের মৃত্যুতে তার চোখ "বিশ্রী"[৭৩]ভাবে মটকে ভাতিজার দিকে চেয়ে হেসেছে। নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার গুলবদনের যে এই দীর্ঘ সংকল্প তার নিজের আর্থিক স্বনির্ভরতার ফলে এসেছে। এই লড়াই এক গৃহবধূর, একজন স্ত্রীর,

একজন মায়ের, একজন দিদার। এতসবকিছুর পরেও এই লড়াইটা নারীর অস্তিত্বের লড়াই। নিজেকে সমাজে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। গল্পে শনিচরী এই লড়াইকে বুকে বহন করে নিয়েছে। শনিচরী থেকে 'রুদালী' বনে যাবার পথে দেখা গেছে অসংখ্য কাঁটা থেকেছে। নিজের জন্য সে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। জীবনের বেঁচে থাকার স্বাদ যে অগাধ ও বিশাল, সেই স্বাদ সে পেতে চেয়েছে। তার কণ্ঠস্বর ও কাজ নারী সমাজের স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের প্রবেশ দরজা খুলে দিয়েছে।

দিন যত এগিয়েছে, ততই বেড়ে চলেছে শ্লীলতাহানির সংখ্যা। আর এই হানির প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করেছে মানুষের অসন্তুষ্ট জীবন-যাপন। নারীরা সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। অথচ ঘটনা এমন ভাবে দেখানো হয়, যেন সবটাই প্রত্যাশিত। মাকে অপমান করা, গৃহবধূকে অপমান করা সবকিছুই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। জীবন জিজ্ঞাসা থেকেই শুরু হয় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। কষ্টে ভরা জীবন তবু চলতে থাকে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে যশোদা, গিরিবালা, জটি, চণ্ডী, ধৌলী, শনিচরীরা অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পূর্ণতার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছে। এই পূর্ণতা এসেছে তাদের আত্মোলব্ধির ফলে। 'গিরিবালা' গল্পে গিরিবালা প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে তৈরি করে নিতে চেয়েছে। গিরিবালার অস্তিত্ব স্বামী নামে প্রতাপের বিরুদ্ধে গিয়ে সমাজের সঙ্গে নিজের নতুন সম্পর্ক প্রতিস্থাপন করেছে। সামাজিক প্রতাপ ও ভাবাদর্শের সম্পর্ক যেহেতু পরস্পর সমান্তরাল অবস্থানে চলে, সেহেতু চন্ডীর মতো নারীকে সমাজের কাছে নিজের মানুষ পরিচয়কে তুলে ধরতে প্রমাণ দিতে হয়। আবার এ কথা সত্য যে, মানুষ থাকতেও এক বাঁয়েনকে মরে প্রমাণ করে করতে হল সে 'বাঁয়েন' নয়। একজন সাধারণ রক্ত মাংসের নারী। সাহিত্য মূলত সামাজিক উচ্চারণ হওয়াতে তাকে সমাজ সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। সেজন্যই তো যে রক্ষণশীল ধর্মীয় সমাজ ধৌলীকে 'বেশ্যা' চিহ্নিত করেছে, সেই সমাজের চিহ্নই জটি 'ঠাকুরণি' রূপে বুকে ধারণ করেছে। 'সাঁঝ সকালের মা' ছোটোগল্পে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থেকেই জটি তার ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের পথ খুঁজে বের করে গেছে। জটি পিতৃপুরুষের পেশাগত পরম্পরাকেই অস্তিত্ব রক্ষার বাণে পরিণত করেছে। কথাকারের ছোটোগল্পে নারীরা সমাজের রুদ্ধ পরিসরকে ভেঙে ফেলার অনবরত সংগ্রাম করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. হালদার, গোপাল। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ। প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ভবন সংস্করণ ২০১৪, পৃ ১৯।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (অনুবাদক)। মনুসংহিতা। আনন্দ, কলকাতা, ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩, পৃ ২৪৮।

৩. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১১)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪, পৃ ৫৪২।

৪. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১৩)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ৫২৮।

৫. তদেব, পৃ ৫২৩।

৬. তদেব, পৃ ৫১৯।

৭. তদেব, পৃ ৫১৯।

৮. তদেব, পৃ ৫২২।

৯. তদেব, পৃ ৫২০।
১০. তদেব, পৃ ৫২৩।
১১. তদেব, পৃ ৫২২।
১২. তদেব, পৃ ৫২২।
১৩. তদেব, পৃ ৫২৩।
১৪. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৫. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৬. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৭. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৮. তদেব, পৃ ৫২৮।
১৯. তদেব, পৃ ৫২৩।
২০. তদেব, পৃ ৫২৮।
২১. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (৯)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৩, পৃ ৪২২।
২২. তদেব, পৃ ৪১৬।
২৩. তদেব, পৃ ৪২৪।
২৪. তদেব, পৃ ৪২৪।
২৫. তদেব, পৃ ৪১৭।
২৬. তদেব, পৃ ৪২৪।
২৭. তদেব, পৃ ৪২০।
২৮. তদেব, পৃ ৪১৯।
২৯. তদেব, পৃ ৪২০।
৩০. তদেব, পৃ ৪২১।
৩১. তদেব, পৃ ৪২১।
৩২. তদেব, পৃ ৪২৫।
৩৩. তদেব, পৃ ৪২৬।
৩৪. তদেব, পৃ ৪২৬।
৩৫. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (৯)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৩, পৃ ৪৩৬।
৩৬. তদেব, পৃ ৪৩১।
৩৭. তদেব, পৃ ৪৩৭।
৩৮. তদেব, পৃ ৪৩৫।
৩৯. তদেব, পৃ ৪৩৯।
৪০. তদেব, পৃ ৪২৬।
৪১. তদেব, পৃ ৪২৭।
৪২. তদেব, পৃ ৪৩২।

৪৩. তদেব, পৃ ৪৪৩।
৪৪. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১০)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ৪০১।
৪৫. তদেব, পৃ ৪০৩।
৪৬. তদেব, পৃ ৪০৭।
৪৭. তদেব, পৃ ৪০৭।
৪৮. তদেব, পৃ ৪০৭।
৪৯. তদেব, পৃ ৪০৯।
৫০. তদেব, পৃ ৪০৭।
৫১. তদেব, পৃ ৪০৭।
৫২. তদেব, পৃ ৪০৩।
৫৩. তদেব, পৃ ৪১৪।
৫৪. তদেব, পৃ ৪১৭।
৫৫. তদেব, পৃ ৪১৭।
৫৬. তদেব, পৃ ৪১৬-৪১৭।
৫৭. তদেব, পৃ ৪১৭।
৫৮. তদেব, পৃ ৪২৯।
৫৯. তদেব, পৃ ৪২৯।
৬০. তদেব, পৃ ৪৩২।
৬১. তদেব, পৃ ৪৩৭।
৬২. তদেব, পৃ ৪৩৭।
৬৩. তদেব, পৃ ৪৩৭।
৬৪. তদেব, পৃ ৪৩৮।
৬৫. তদেব, পৃ ৪৩৯।
৬৬. তদেব, পৃ ৪৩৯।
৬৭. তদেব, পৃ ৪১৮।
৬৮. তদেব, পৃ ৪১৮।
৬৯. তদেব, পৃ ৪২১।
৭০. তদেব, পৃ ৪২১।
৭১. তদেব, পৃ ৪৪০।
৭২. তদেব, পৃ ৪৪০।
৭৩. তদেব, পৃ ৪৪০।

আকর গ্রন্থ:

১. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (৯)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৩।

২. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১০)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫।
৩. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১৩)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৫।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. হালদার, গোপাল। সংস্কৃতির বিশ্বরূপ। প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ভবন সংস্করণ ২০১৪।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (অনুবাদক)। মনুসংহিতা। আনন্দ, কলকাতা, ৭০০০০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৩।
৩. দেবী, মহাশ্বেতা। রচনা সমগ্র (১১)। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৪।